আধ্যাত্মিক বনাম ধার্মিক

-বিপ্লব

ইদানিং ইফোরামের বিতর্কে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি ঃ

- আধ্যাত্মিকতার বদ হজমে, কিছু ব্যক্তি শরীয়ার এসিড ঢেঁকুর তুলছেন।

- কোরানের বিতর্কিত আয়াতগুলি বাদ দিয়ে, হাদিস এবং শরীয়া বাদ দিয়ে, ইসলামকে যুগোপযোগী করার চেস্টা চলছে। রাজা রামমোহন রায় এই একই কাজ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। বেদকে সংস্কার করে। মনুবাদ তুলে দিয়ে। এই ধরনের সংস্কার ফলপ্রসু হয়। ইতিহাস সাক্ষী।

- রবীন্দ্রনাথের উপর সাম্প্রতিক বিতর্কে দেখা গেল, স্বয়ং গুরুদেবও আধ্যাত্মিকতার জীর্নহজমে ভুগতেন এবং তিনিও গদগদ হয়ে অজান্তেই মনুবাদের ঢেকুর তুলেছেন।

স্বয়ং গুরুদেবেরই যখন এই শামুকে পা কেটেছে, তখন জীয়াউদ্দিন ইত্যাদিদের আর কি ই বা বলি?

এই সব ধার্মিক ব্যক্তিদের সমস্যা হচ্ছে, ইনারা জানেন না, কিসের সন্ধানে এই নরদেহে জীবন যোগ হয়! তাই ধর্মকেই আধ্যাত্মিকতা ভেবে, নিজেদের অজান্তেই ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষতি সাধনে ব্রত হয়েছে। এই মূহুর্তে, সবার প্রথমে উনাদের বোঝা দরকার ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য।

আধ্যাত্মিকতা কি?

মানুষের মৌলিক চাহিদার তিন স্তর। প্রথমে ক্ষুদার জগতে পৃথিবী গদ্যময়। পেটের ক্ষিদে প্রথম চাহিদা। পেটের চাহিদা মিটলে, সবার প্রথমে মানুষের মনে যৌনাকাঙ্খা জাগে। সেটা যে শুধু দেহমিলনেই প্রকাশ পায় তা নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল থেকে, অপত্য স্নেহের নানান অবচেতন মননে এর প্রকাশ। আগে এটাকে বলা হত ফ্রেয়েডিয়ান-এখন বলা হচ্ছে বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞান। সেটাও যখন তৃপ্ত হয়, তখন জাগে আরো প্রশ্ন-আমি কে? আমার জন্মের উদ্দেশ্য কি? সৃস্টির প্রতি আমার ভূমিকা কি? সৃস্টিই বা কি? সৃস্টির উদ্দেশ্যই বা কি? এই কৌতুহলের উত্তর খুঁজতে আধ্যাত্মিকতার শুরু-উত্তোরন হয় উন্নততর অপোরাক্ষ অনুভুতিতে। যে মানসিক জগতে ক্রোধ, ঘৃণা, লোভ, হিংসা, কামনা নেই-আছে অনাবিল, অনন্ত আনন্দ।

এই প্রশ্ন মনে জেগে ওঠা কি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার? মোটেও না। মস্তৃস্কবিজ্ঞানের বিশিষ্ট গবেষক আন্ড্রেও নিউবার্গ তাঁর গ্রন্থ ‘ Why God Won't Go Away‘ তে জানালেন, আমাদের মস্তৃস্কের গঠনটাই এমন যে আধ্যাত্মিকতার চাহিদাটা অনেকটাই

মৌলিক। সাধন, ভজন এবং প্রার্থনা মস্তৃস্কের তিনটি অংশের উপর কাজ করে- হাইপোথালামাস, আমিগ ডালা এবং হিপ্পোক্যাম্পাস। এদের সিনক্রোনাইজ করে, প্লাজমা করিস্টল হর্মোন নিষঃরন কমিয়ে দেয়। এতে মানসিক চাপ কমে, মনে আনন্দের ভাব আসে। আরো গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার হচ্ছে গভীর সাধনার স্তরে, বিজ্ঞানীরা মনের এক নতুন স্তর আবিস্কার করেছেন-একে বলে unitary states. এই ধাপে সাধকের মনে স্থান কালের ধারণা লোপ পায়-সে নিজেকে অন্য জগতের লোক বলে মনে করে। মস্তৃস্কের OAA (orientation association area) বলে একটি স্থান আছে, যা মানুষকে স্থান এবং সময়ের ধারণা দেয় । গভীর সাধনার জগতে OAA কার্য লোপ পায়। ফলে বিচিত্র সব জগৎ বহির্ভূত অনুভূতি হয়-যা এতোদিন অবতার বা নবীদের দল ঐশী অনুভূতি বলে জানিয়ে এসেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাঝে মাঝেই সমাধি হত। ভক্তরা এবং তিনি নিজেও মনে করতেন, ইহজগতের থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন। মহম্মদের আধ্যাত্মিক জীবনেও একই ঘটনা ঘটে- তিনিও গুহার মধ্যে প্রবল সাধনার ফলে, Unitary States প্রাপ্ত হন। এবং জগৎ বহির্ভুত অনুভুতি গুলিকে ঐশ্বরিক অনুভুতি বা ঈশ্বর প্রেরিত বানী বলে ভেবে নেন।

মহম্মদ বা রামকৃষ্ণের সাধনানুভুতিগুলি সত্যই আমাদের পরিচিত জগৎ অনুভুতির (বা আমাদের দৈনন্দিন স্থান কালের ধারণা) থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঈশ্বর বা আল্লার কোন গন্ধ নেই। গভীর সাধনার ফলে বস্তুবাদী মনের ইউনিটারী স্তরে তাঁরা ছিলেন-স্থান কালের অনুভুতি লোপ পেয়েছিল। তখনকার নিয়মমত তাঁরা নিজেদের ঈশ্বর প্রেরিত অবতার বলে দাবী করেছেন। এই আবিস্কার হয়েছে Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) এর মস্তৃস্ক ইমেজ কাজে লাগিয়ে (২০০৩)।

ধর্ম তাহলে কি?

অর্থনৈতিক দৃস্টীভঙ্গীতে আমরা দেখলাম আধ্যাত্মিকতা আমদের মৌলিক চাহিদা। ধর্ম হচ্ছে এই চাহিদা মেটাবার প্রোডাক্ট। বা পণ্য। ইসলাম, হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, সবাই নিজেদের পণ্য নিয়ে বসে আছেন-ইতিহাস এবং সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে, মানুষের আধ্যাত্মিকতার চাহিদা মিটিয়েছে ধর্ম নামক পণ্যটি (G.E.Lensky 1963: Religious Factor) ।

প্রত্যেক ধর্মেই আধ্যাত্মিকতার সোপান হিসাবে সংযমী, সৎ এবং ন্যায়-পরায়ন জীবনযাপনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্নায়ুগুলির উপর সংযম না থাকলে প্রার্থনা বা নামাজে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। মানে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হয় না।

সেই জন্য হিন্দু বা ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে সংযমী সমাজ তৈরী করতে হবে। যাতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতার উত্তরোনের মাধ্যমে ঐশী অনুভূতির শরিক

হওয়া যায়। বৌদ্ধরা একে নির্বাণ বলেন। মুসলিমরা বলেন আল্লার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন। হিন্দুদের কাছে এ হল সমাধি।
তাই সংযমী সমাজের উদ্দেশ্যে হিন্দুরের প্রস্তাবনা মনুবাদ। ইসলামের শরীয়া।

শরীয়া বা মনুবাদী হয়ে, আধ্যাত্মিক হওয়া যায়? না আধ্যাত্মিকতার কোন লাভ হয়?

প্রথম বক্তব্য হল, ধর্ম ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতায় গোড়ায় গলদ। আমি আগেই বলেছি, বিজ্ঞান প্রমাণিত ব্যাখ্যা হল ভাববাদী ঈশ্বর-অনুভুতি বা আল্লাহ অনুভুতি আসলেই বস্তুবাদী অনুভূতি। তবে প্রার্থনায় যেহেতু মনের শরীর ভালো থাকে, উন্নততর মানবিক গুনের অধিকারী হওয়া যায়, সেহেতু কেও যদি নামাজ বা পূজা অর্চনায় মনের শান্তি পান, আপত্তি নেই। তাহলে, পূজা-অর্চনা বা নামাজের উদ্দেশ্য কি দাঁড়াচ্ছে?

- মনের শান্তি
- উন্নততর মানবিক গুন- মানে মনকে অহংবোধ, হিংসা, রাগ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা

কোন আল্লা বা ঈশ্ব র এর মধ্যে নেই। কারণ, আমি প্রমান দেখিয়েছি তা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

এবার আসুন আমরা দেখি সমাজের কোন দাবী গুলো মিটলে, সংসারে থেকেও সাধনার দ্বারা এই উন্নততর মানবিকগুনের অধিকারী হওয়া যায়?

- যেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে-মানে উন্নততর বস্তুবাদী সিস্টেম আছে। যেমন আমেরিকা। খাদ্য আহোরনে লোককে মারপিট করতে হয় না। মিথ্যা কথা বলতে হয় না। অধিক পরিশ্রম করতে হয় না।
- মানুষের যৌন দাবি মেটানোর সুস্থ ব্যবস্থা আছে। যে পুরুষ বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছে, তার মন সর্বদা নারীময়। তার অন্যকোন সাবজেক্ট ভাল লাগে না! আধ্যাত্মিকতা কোন ছার! বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্যও একই কথা খাটে। অর্থাৎ বিবাহযোগ্য নরনারীর মেলা মেশার একটা ব্যবস্থা আছে। শরীরে যৌন ক্ষিদে থাকলে, হাজার ধ্যান বা নামাজেও কিছু হবে না।
- গনতন্ত্র আছে। যেখানে মনের কথা, ক্ষোভ, দুঃখ সব বলা যায়। সমালোচনার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনা যায়। সৎ কথা বললে খুন হওয়ার ভয় নেই।
- আশে পাশের লোকেরা সৎ-লোকে ঘুঁশ খায় না। তাই সৎ আচরনের সুযোগ আছে।

এত এব আমরা কি পাচ্ছি? কেও আধ্যাত্মবাদী হতে চাইলে আমেরিকার বা পাশ্চাত্যের সমাজ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ সমাজ। কারণ এরা সৎ। এখানে খাবারের অভাব নেই। যৌন চাহিদা মেটানোও সহজ।

যে সমাজ, শরীয়া বা মনুবাদ পুরো বা আংশিক মানছে, তাদের অবস্থাটা কি? বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, ইরাণ, সৌদি আরব অসাধুতায় এবং অসৎতায় এক নাম্বারে। খাবার যোগার করা আধিকাংশ লোকের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার। তার উপর, ইসলাম আর হিন্দুত্বের সংরক্ষনশীল সমাজের অত্যাচারে, অধিকাংশ নারী-পুরুষের যৌনতা অবদমিত। ফলে কোলকাতায় বা ঢাকায় বাসে ঘাটের ভিড়ে, মেয়েদের শরীরের উপর চোরা-গোপ্তা হাত চলে। মধ্যপ্রাচ্যের যৌন বুবুক্ষ যুবকেরা যে ভাবে মেয়েদের দিকে তাকায়, তাতে তাদের দিনে হাজার বার নামাজ পড়ালেও কিছু হবে না। এই সমাজে হাজার হাজার সগীর আলি জন্মালেও, এরা কাদাতেই পচবে।

অর্থাৎ সফল আধ্যাত্মিক সমাজ গড়ার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, স্বাধীনচেতা সমৃদ্ধশালী বস্তুবাদী সমাজ তৈরী করা। সমৃদ্ধশালী সমাজ তখনই গড়ে ওঠে, যখন সেই সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার উপর গঠিত হয়।

পরাকীয়ার জন্য, পাথর ছুঁরে মেরে ফেলে বা নারীর উপর পুরুষের কাপুরুষত্ব ফলিয়ে সামন্ততান্ত্রিক পরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। যে শরীয়া বা মনুবাদে মেয়েদের ভোগের সামগ্রী এবং প্রজনন যন্ত্র ব্যতীত কিছু ভাবা হয় না, সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারাতো দূরে থাক, মেয়েদের প্রতি নূন্যতম মানবিক ধারণাবোধ টুকুও নেই। মমত্বও নেই। মনুসংহিতা বা শরীয়া দেখে মনে হয়ে, এগুলো মানুষ না পশুদের জন্য লেখা?

আমাদের মায়েদের গৃহপালিত গাভী বানিয়ে, কেও যদি আধ্যাত্মিকতার খোয়াব দেখেন, প্রথমেই বলতে হয়, তিনি ধর্ম এডিক্ট। না বুজেছেন আধ্যাত্মিকতা। না সমাজ।

এবং চতুস্পদী তালিবানদের চরকায় তেল দিচ্ছেন। বা ভবিষ্যতে নিজেরাই তালিবানদের খাতায় নাম লেখাবেন। পুরুষের প্রতি ভরসা নেই, তাই মেয়েদের প্রতি আহ্বান, আপনারা সর্তক থাকুন। নইলে আপনাদের ধর্ষকরা, আধ্যাত্মিকতার ভন্ডামি চালিয়ে যাবে।

১০/২/২০০৫
ক্যালিফোর্নিয়া